আর রূম

৩০

নামকরণ

প্রথম আয়াত غُلِبَتِ الرُّوْمُ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা থেকে নাযিলের সময়-কাল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, "নিকটবর্তী দেশে রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।" সে সময় আরবের সন্নিহিত রোম অধিকৃত এলাকা ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর ইরানীদের বিজয় ৬১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ সূরাটি সে বছরই নাযিল হয় এবং হাবশায় হিজরাতও এ বছরই অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য রসূল হবার সুস্পষ্ট প্রমাণগুলোর অন্যতম। এটি অনুধাবন করার জন্য এ আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের ৮ বছর আগের একটি ঘটনা। রোমের কায়সার মরিসের (Mauric) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। ফোকাস (Phocas) নামক এক ব্যক্তি রাজ সিংহাসন দখল করে। সে প্রথমে কায়সারের চোখের সামনে তাঁর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করায় তারপর নিজে কায়সারকে হত্যা করে পিতা ও পুত্রদের কর্তিত মস্তকগুলো কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে দেয়। এর কয়েকদিন পর সে কায়সারের স্ত্রী ও তার তিন কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার ফলে ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রোম আক্রমণ করার চমৎকার নৈতিক ওজুহাত খুঁজে পান। কায়সার মরিস ছিলেন তাঁর অনুগ্রাহক। তাঁর সহায়তায় পারভেজ ইরানের সিংহাসন দখল করেন। তাই তিনি তাঁকে নিজের পিতা বলতেন। এ কারণে তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্বাসঘাতক ফোকাস আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে জুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফোকাসের সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরের

www.icsbook.info

এডেসার (বর্তমান উরফা) এবং অন্যদিকে সিরিয়ার হালব ও আন্তাকিয়ায় পৌঁছে যান। রোমের রাজ পরিষদ যখন দেখলো ফোকাস দেশ রক্ষা করতে পারছে না তখন তারা আফ্রিকার গবর্নরের সাহায্য চাইলো। গবর্নর তার পুত্র হিরাক্লিয়াসকে (Heraclius) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী সহকারে কনষ্টান্টিনোপলে পাঠান। তার সেখানে পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার পরিবর্তে হিরাক্লিয়াসকে কায়সার পদে অভিসিক্ত করা হয়। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাসের সাথে একই ব্যবহার করেন যা সে ইতিপূর্বে মরিসের সাথে করেছিল। এটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা এবং এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত লাভ করেন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাবাজীর ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ফোকাসের পদচ্যুতি ও তার হত্যার পর তা খতম হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ফোকাসের থেকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো তাহলে তার নিহত হবার পর নতুন কায়সারের সাথে পারভেজের সন্ধি করে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এরপরও যুদ্ধ জারী রাখেন। বরং এরপর তিনি এ যুদ্ধকে অগ্নি উপাসক ও খৃষ্টবাদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ দেন। খৃষ্টানদের যেসব সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত ও নাস্তিক গণ্য করে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় গীর্জা বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল (অর্থাৎ নাস্তূরী, ইয়াকূবী ইত্যাদি) তারাও আক্রমণকারী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সর্বাত্মক সহানুভূতি দেখাতে থাকে। এদিকে ইহুদিরাও অগ্নি উপাসকদেরকে সমর্থন দেয়। এমন কি খসরু পারভেজের সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণকারী ইহুদী সৈন্যদের সংখ্যা ২৬ হাজারে পৌঁছে যায়।

হিরাক্লিয়াস এসে এ বাঁধ ভাংগা স্রোত রোধ করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই পূর্বদেশ থেকে প্রথম যে খবরটি তাঁর কাছে পৌঁছে সেটি ছিল ইরানীদের হাতে আন্তাকিয়ার পতন। তারপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তারা দামেশক দখল করে। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিস দখল করে ইরানীরা সমগ্র খৃষ্টান জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ৯০ হাজার খৃষ্টানকে এই শহরে হত্যা করা হয়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র আল কিয়ামাহ গীর্জা (Holy Sepulchre) ধ্বংস করে দেয়া হয়। আসল ক্রুশ দণ্ডটি, যে সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হযরত মসীহকে তাতেই শূলীবিদ্ধ করা হয়েছিল, ইরানীরা ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েন পৌঁছিয়ে দেয়। আর্চবিশপ যাকারিয়াকেও পাকড়াও করা হয় এবং শহরের সমস্ত বড় বড় গীর্জা তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খসরু পারভেজ বিজয়ের নেশায় যেভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তা বায়তুল মাকদিস থেকে হিরাক্লিয়াসকে তিনি যে পত্রটি লিখেছিলেন তা থেকে আন্দাজ করা যায়। তাতে তিনি বলেন :

"সকল খোদার বড় খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধিকারী খসরুর পক্ষ থেকে তার নীচ ও মূর্খ অজ্ঞ বান্দা হিরাক্লিয়াসের নামে—

"তুমি বলে থাকো, তোমার খোদার প্রতি তোমার আস্থা আছে। তোমার খোদা আমার হাত থেকে জেরুশালেম রক্ষা করলেন না কেন?"

এ বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে ইরানী সেনাদল জর্দান, ফিলিস্তীন ও সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ দখল করে পারশ্য সাম্রাজ্যের সীমানা মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। এটা এমন এক

www.icsbook.info

সময় ছিল যখন মক্কা মু'আয্‌যমায় এর চাইতে আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছিল। এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীনে তাওহীদের পতাকাবাহীরা কুরাইশ সরদারদের নেতৃত্বে শিরকের পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে স্বদেশ ত্যাগ করে হাবশার খৃষ্টান রাজ্যে (রোম সাম্রাজ্যের মিত্র দেশ) আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে ইরানের বিজয় অভিযানের কথা ছিল সবার মুখেমুখে, মক্কার মুশরিকরা এসব কথায় আহলাদে আটখানা হয়ে উঠছিল। তারা মুসলমানদের বলতো, দেখো, ইরানের অগ্নি উপাসকরা বিজয়লাভ করেছে এবং অহী ও নবুওয়াত অনুসারী খৃষ্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে চলছে। অনুরূপভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারীরাও তোমাদেরকে এবং তোমাদের দীনকে ধ্বংস করে ছাড়বো।

এ অবস্থায় কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় ঃ "নিকটবর্তী দেশে রোমানরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই আবার তারা বিজয়ী হবে। আর সেটি এমন দিন হবে যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মু'মিনরা খুশী হয়ে যাবে।" এর মধ্যে একটির পরিবর্তে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রোমানরা জয় লাভ করবে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুসলমানরাও একই সময় বিজয় লাভ করবে। আপাতদৃষ্টে এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন একটিরও কয়েক বছরের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হবার কোন দূরতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান। তারা মক্কায় নির্যাতিত হয়ে চলছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত কোনদিক থেকে তাদের বিজয় লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। অন্যদিকে রোমের পরাজয়ের বহর দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। ৬১৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। অগ্নি উপাসক সেনাদল ত্রিপোলির সন্নিকটে পৌঁছে তাদের পতাকা গেঁড়ে দিয়েছিল। এশিয়া মাইনরে ইরানী সেনাদল রোমানদের বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করতে করতে বসফোরাস প্রণালীতে পৌঁছে গিয়েছিল ৬১৭ সালে তারা কনস্ট্যান্টিনোপলের সামনে খিলকদুন (Chalcedon : বর্তমান কাযীকোই) দখল করে নিয়েছিল। কায়সার খসরুর কাছে দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও দীনতা সহকারে আবেদন করলেন, আমি যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, "এখন আমি কায়সারকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা দেবো না যতক্ষণ না তিনি শৃংখলিত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হন এবং তাঁর শূলীবিদ্ধ ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অগ্নি খোদার উপাসনা করেন।" অবশেষে কায়সার এমনই পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজে (Carthage : বর্তমান টিউনিস) চলে যাবার পরিকল্পনা করলেন। মোটকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত আট বছর পর্যন্ত অবস্থা এমন ছিল যার ফলে রোমানরা ইরানীদের ওপর বিজয় লাভ করবে এ ধরনের কোন কথা কোন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারতো না। বরং বিজয় তো দূরের কথা তখন সামনের দিকে এ সাম্রাজ্য আর টিকে থাকবে এ আশাও কারো ছিল না।*

* Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. ii. P. 788, Modern Library, New York.

www.icsbook.info

কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল হলে মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুবই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। উবাই ইবনে খাল্‌ফ হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বাজী রাখে। সে বলে, যদি তিন বছরের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করে তাহলে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো অন্যথায় তুমি আমাকে দশটা উট দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাজীর কথা জানতে পেরে বলেন, কুরআনে বলা হয়েছে فِي بِضْعِ سِنِيْنَ আর আরবী ভাষায় بِضْع শব্দ বললে দশের কম বুঝায়। কাজেই দশ বছরের শর্ত রাখো এবং উটের সংখ্যা দশ থেকে বাড়িয়ে একশো করে দাও। তাই হযরত আবু বকর (রা) উবাইর সাথে আবার কথা বলেন এবং নতুনভাবে শর্ত লাগানো হয় যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে অন্যপক্ষকে একশোটি উট দেবে।

৬২২ সালে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাত করে মদীনা তাইয়েবায় চলে যান অন্যদিকে কায়সার হিরাক্লিয়াস নীরবে কষ্টান্টিনোপল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে ত্রাবিজুনের দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি পেছন দিক থেকে ইরানের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই প্রতি–আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য কায়সার গীর্জার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে খৃষ্টীয় গীর্জার প্রধান বিশপ সারজিয়াস((Sergius) খৃষ্টবাদকে মাজুসীবাদের (অগ্নিপূজা) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গীর্জাসমূহে ভক্তদের নজরানা বাবদ প্রদত্ত অর্থ সম্পদ সূদের ভিত্তিতে ঋণ দেন। হিরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়া থেকে নিজের আক্রমণ শুরু করেন। দ্বিতীয় বছর ৬২৪ সালে তিনি আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্ট্রের জন্মস্থান আরমিয়াহ (Clorumia) ধ্বংস করেন এবং ইরানীদের সর্ববৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহর মহিমা দেখুন, এই বছরেই মুসলমানরা বদর নামক স্থানে মুশরিকদের মোকাবিলায় প্রথম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। এভাবে সূরা রূমে উল্লেখিত দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই দশ বছরের সময়সীমা শেষ হবার আগেই একই সংগে সত্য প্রমাণিত হয়।

এরপর রোমান সৈন্যরা অনবরত ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করে যেতেই থাকে। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিনেভার যুদ্ধে তারা পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এরপর পারস্য সম্রাটদের আবাসস্থল বিধ্বস্ত করে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তারা তদানীন্তন ইরানের রাজধানী তায়াসফুনের (Ctesiphon) দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। ৬২৮ সালে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাকে বন্দী করা হয়। তার চোখের সামনে তার ১৮ জন পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। কয়েক দিন পরে কারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে কুরআন মহা বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছে এবং এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ সমস্ত রোম অধিকৃত এলাকার ওপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে এবং আসল ক্রুশ ফিরিয়ে দিয়ে রোমের সাথে সন্ধি করে। ৬২৯ সালে "পবিত্র ক্রুশ"কে স্বস্থানে স্থাপন করার জন্য কায়সার নিজে "বায়তুল মাকদিস" যান এবং এ বছরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযা উমরাহ আদায় করার জন্য হিজরাতের পর প্রথম বার মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রবেশ করেন।

এ পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যে, পুরোপুরি সত্য ছিল এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহের অবকাশই ছিল না। আরবের বিপুল সংখ্যক মুশরিক এর প্রতি ঈমান আনে।

www.icsbook.info

উবাই ইবনে খাল্‌ফের উত্তরাধিকারীদের পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবু বকরকে (রা) বাজীর একশো উট দিয়ে দিতে হয়। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। নবী (সা) হুকুম দেন, এগুলো সাদকা করে দাও। কারণ বাজী যখন ধরা হয় তখন শরীয়াতে জুয়া হারাম হবার হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখন তা হারাম হবার হুকুম এসে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধের ম..্যমে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফেরদের থেকে বাজীর অর্থ নিয়ে নেয়ার অনুমতি তো দিয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু এই সংগে হুকুম দেয়া হয়, তা নিজে ভোগ না করে সাদকা করে দিতে হবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় বক্তব্য এভাবে শুরু করা হয়েছে, আজ রোমানরা পরাজিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী মনে করছে এ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আজ যে পরাজিত সেদিন সে বিজয়ী হয়ে যাবে।

এ ভূমিকা থেকে একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের বাহ্য দৃষ্টির কারণে শুধুমাত্র তাই দেখে যা তার চোখের সামনে থাকে। কিন্তু এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এ বাহ্যদৃষ্টি যখন দুনিয়ার সামান্য সামান্য ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত অনুমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যখন শুধুমাত্র "আগামীকাল কি হবে" এতটুকু কথা না জানার কারণে মানুষ ভুল হিসেব করে বসে তখন সামগ্রিকভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে ইহকালীন বাহ্যিক জীবনের ওপর নির্ভরশীলতা এবং এরি ভিত্তিতে নিজের সমগ্র জীবন পুঁজিকে বাজী রাখা মস্ত বড় ভুল, তাতে সন্দেহ নেই।

এভাবে রোম ও ইরানের বিষয় থেকে ভাষণ আখেরাতের বিষয়ের দিকে মোড় নিয়েছে এবং ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত বিভিন্নভাবে একথা বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আখেরাতের জীবন সম্ভব, যুক্তিসংগত এবং এর প্রয়োজনও আছে। মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করে রাখার স্বার্থেও তার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস করে বর্তমান জীবনের কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বাহ্যদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে কর্মসূচী গ্রহণ করার যে পরিণাম হয়ে থাকে তাই হতে বাধ্য।

এ প্রসংগে আখেরাতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব-জগতের যেসব নিদর্শনকে সাক্ষ-প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে সেগুলো তাওহীদেরও প্রমাণ পেশ করে। তাই চতুর্থ রুকূ'র শুরু থেকে তাওহীদকে সত্য ও শিরককে মিথ্যা প্রমাণ করাই ভাষণের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং বলা হয়, মানুষের জন্য পুরোপুরি একনিষ্ঠ হয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী করা ছাড়া আর কোন প্রাকৃতিক ধর্ম নেই। শিরক বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই যেখানেই মানুষ এ ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করেছে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে আবার সেই মহা বিপর্যয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময় দুনিয়ার দু'টি সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছে, এ বিপর্যয়ও শিরকের অন্যতম ফল এবং মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তারা সবাই ছিল মুশরিক।

www.icsbook.info

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে উপমার মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মৃত পতিত যমীন আল্লাহ প্রেরিত বৃষ্টির স্পর্শে সহসা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং জীবন ও ফসলের ভাণ্ডার উদ্‌গীরণ করতে থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ প্রেরিত অহী ও নবুওয়াতও মৃত পতিত মানবতার পক্ষে রহমতের বারিধারা স্বরূপ এবং এর নাযিল হওয়া তার জন্য জীবন, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং কল্যাণের উৎসের কারণ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে আরবের এ অনুর্বর ভূমি আল্লাহর রহমতে শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে এবং সমস্ত কল্যাণ হবে তোমাদের নিজেদেরই জন্য। আর এর সদ্ব্যবহার না করলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তারপর অনুশোচনা করেও কোন লাভ হবে না এবং ক্ষতিপূরণ করার কোন সুযোগই পাবে না।

www.icsbook.info

আয়াত ৬০ # সূরা আর রূম–মক্কী রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓمّٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ
يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الرَّحِيْمُ ۝٥ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।[১] ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে।[২] আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে।[৩] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

১. ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রোম ও ইরানের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমের পক্ষে এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল ইরানের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এক, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃষ্টবাদ ও অগ্নি পূজার মতবাদের যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল। তারা দেশ জয়ের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে একে অগ্নি পূজার মতবাদ বিস্তারের মাধ্যমে পরিণত করছিল। বায়তুল মাকদিস জয়ের পর খসরু পারভেজ রোমের কায়সারের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে নিজের বিজয়কে তিনি অগ্নি উপাসনাবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নীতিগতভাবে অগ্নি উপাসনাবাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের ধর্মের মিল ছিল। কারণ, তারাও ছিল তাওহীদ অস্বীকারকারী। তারা দুই খোদাকে মানতো এবং আগুনের

www.icsbook.info

পূজা করতো। তাই মুশরিকরা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মোকাবিলায় খৃষ্টানরা যতই শিরকে লিপ্ত হয়ে যাক না কেন তবুও তারা তাওহীদকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে স্বীকার করতো। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো এবং অহী ও রিসালাতকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে মানতো। তাই তাদের ধর্ম তার আসল প্রকৃতির দিক থেকে মুসলমানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের ওপর মুশরিক জাতির বিজয়কে তারা অপছন্দ করতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এক নবীর আগমনের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীকে যারা মানতো নীতিগতভাবে তারা মুসলমানের সংজ্ঞারই আওতাভুক্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আগমনকারী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌছে এবং তারা তা অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। (দেখুন সূরা কাসাস, ৭৩ টীকা) সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচ-ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো বাইরে পৌছেনি। তাই মুসলমানরা খৃষ্টানদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করতো না। তবে ইহুদীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল কাফের। কারণ তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তৃতীয় কারণ ছিল, ইসলামের সূচনায় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৫ এবং সূরা মায়েদার ৮২ থেকে ৮৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক খোলা মন নিয়ে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করছিল। তারপর হাবশায় হিজরাতের সময় খৃষ্টান বাদশাহ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেন এবং তাদের ফেরত পাঠাবার জন্য মক্কার কাফেরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এরও দাবী ছিল মুসলমানরা অগ্নি পূজারীদের মোকাবিলায় খৃষ্টানদের কল্যাণকামী হোক।

২. অর্থাৎ পূর্বে যখন ইরানীরা জয়লাভ করে তখন নাউযুবিল্লাহ তার অর্থ এটা ছিল না যে, বিশ্ব-জাহানের প্রভু আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে গেছেন এবং পরে যখন রোমীয়রা জয়লাভ করবে তখন এর অর্থ এ হবে না যে, আল্লাহ তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন। সর্ব অবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। পূর্বে যে বিজয় লাভ করে তাকে আল্লাহই বিজয় দান করেন এবং পরে যে জয় লাভ করবে সেও আল্লাহরই হুকুমে জয়লাভ করবে। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউ নিজের শক্তির জোরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। তিনি যাকে উঠান সে-ই ওঠে এবং যাকে নামিয়ে দেন সে-ই নেমে যায়।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা), সুফিয়ান সওরী (র), সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বর্ণনা করেন, ইরানীদের ওপর রোমীয়রা এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর মুসলমানরা একই সময় বিজয় লাভ করেন। এ জন্য মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দিত হয়। ইরান ও রোমের ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ হয়। এ বছরই রোমের কায়সার অগ্নি উপাসনাবাদের প্রবর্তক যরথুষ্ট্রের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং ইরানের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন।

www.icsbook.info

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧
اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ
رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

লোকেরা দুনিয়ার কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফিল।[৪] তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি?[৫] আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৬] কিন্তু অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।[৭]

৪. অর্থাৎ যদিও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করার মতো বহু সাক্ষ ও নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলো থেকে গাফিল হবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তবুও এরা নিজেরাই গাফিল থাকছে। অন্য কথায় এটা তাদের নিজেদের ত্রুটি। দুনিয়ার জীবনের এ বাহ্যিক পর্দার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা বসে রয়েছে। এর পেছনে যা কিছু আসছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। নয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাবার ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করা হয়নি।

৫. এটি আখেরাতের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে যদি এরা বাইরে কোথাও দৃষ্টি দেবার পূর্বে নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেদের মধ্যেই এমন সব যুক্তি পেয়ে যেতো যা বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবনের প্রয়োজনের সত্যতা প্রমাণ করতো। মানুষের এমন তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে যা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে :

এক : পৃথিবী ও তার পরিবেশের অসংখ্য জিনিস তার বশীভূত করে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করার ব্যাপক ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে।

দুই : নিজের জীবনের পথ বেছে নেবার জন্য তাকে স্বাধীন ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। ঈমান ও কুফরী, আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পথের মধ্য থেকে যে কোন পথেই নিজের ইচ্ছামতো সে চলতে পারে। সত্য ও মিথ্যা এবং সঠিক ও বেঠিক যে কোন পথই সে অবলম্বন করতে পারে। প্রত্যেকটি পথে চলার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে এবং এ চলার জন্য সে আল্লাহর সরবরাহকৃত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে পারে তা আল্লাহর আনুগত্যের বা তাঁর নাফরমানির যে কোন পথই হোক না কেন।

www.icsbook.info

তিন : তার মধ্যে জন্মগতভাবে নৈতিকতার অনুভূতি রেখে দেয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে সে ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে, ইচ্ছাকৃত কাজকে সৎকাজ ও অসৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে এই মত অবলম্বন করে যে, সৎকাজ পুরস্কার লাভের এবং অসৎকাজ শাস্তি লাভের যোগ্য হওয়া উচিত।

মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এই যে তিনটি বৈশিষ্ট পাওয়া যায় এগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, এমন কোন সময় আসা উচিত যখন মানুষের সমস্ত কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যখন তাকে জিজ্ঞস করা হবে, তাকে দুনিয়ায় যা কিছু দেয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করার ক্ষমতাকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে? যখন দেখা যাবে, নিজের নির্বাচনের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে সে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, না ভুল পথ? যখন তার ঐচ্ছিক কার্যাবলী যাচাই করা হবে এবং সৎকাজে পুরস্কার ও অসৎকাজে শাস্তি দেয়া হবে। একথা সুনিশ্চিত যে, মানুষের জীবনের কার্যাবলী শেষ হবার এবং তার কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবার পরই এ সময়টি আসতে পারে, তার আগে আসতে পারে না। আর এ সময়টি অবশ্যই এমন সময় আসা উচিত যখন এক ব্যক্তি বা একটি জাতির নয় বরং সমগ্র মানবজাতির কর্মদপ্তর বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কোন ব্যক্তি বা জাতির নিজের কার্যাবলীর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে যেসব প্রভাব বিস্তার করে যায় উক্ত ব্যক্তি বা জাতির মৃত্যুতে তার ধারাবাহিকতা খতম হয়ে যায় না। তার রেখে যাওয়া ভালো বা মন্দ প্রভাবও তো তার আমলনামায় লিখিত হওয়া উচিত। এ প্রভাবগুলো যে পর্যন্ত না পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে যায় সে পর্যন্ত ইনসাফ অনুযায়ী পুরোপুরি হিসেব-নিকেশ করা এবং পুরোপুরি পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া কেমন করে সম্ভব? এভাবে মানুষের নিজের অস্তিত্ব একথার সাক্ষ পেশ করে এবং পৃথিবীতে মানুষকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে তা স্বতস্ফূর্তভাবে এ দাবী করে যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের পরে আর একটি জীবন এমন হতে হবে যেখানে আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনসাফ সহকারে মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যাবলীর হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে।

৬. এ বাক্যে আখেরাতের সপক্ষে আরো দু'টি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মানুষ যদি নিজের অস্তিত্বের বাইরে বিশ্ব ব্যবস্থাকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাহলে দু'টি সত্য সুস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিগোচর হবে :

এক : এ বিশ্ব-জাহানকে যথার্থ সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন শিশুর খেলা নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য নিজের খেয়ালখুশী মতো সে উল্টা পাল্টা ধরনের যে কোন রকমের একটা ঘর তৈরি করেনি যা তৈরি করা ও ভেঙে ফেলা দুটোই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বরং এটি একটি দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা। এর প্রতিটি অণু পরমাণু এ কথারই সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, একে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে তৈরী করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একটি আইন সক্রিয় রয়েছে। এর প্রত্যেকটি জিনিসই উদ্দেশ্যমূখী। মানুষের সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একথারই সাক্ষবহ। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের পেছনে সক্রিয় নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করে এবং প্রত্যেকটি বস্তু যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করেই মানুষ এখানে এ সবকিছু তৈরী করতে পেরেছে। অন্যথায় যদি একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন খেলনার

www.icsbook.info

মধ্যে একটি পুতুলের মতো তাকে রেখে দেয়া হতো, তাহলে কোন প্রকার বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা কল্পনাই করা যেতো না। এখন যে জ্ঞানবান সত্তা এহেন প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখীতা সহকারে এ দুনিয়া তৈরি করেছেন এবং এর মধ্যে মানুষের মতো একটি সৃষ্টিকে সর্ব পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার, স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে নিজের দুনিয়ার অসংখ্য সাজ-সরঞ্জাম তার হাতে সঁপে দিয়েছেন, তিনি মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেছেন একথা কেমন করে তোমাদের বোধগম্য হলো? তোমরা কি দুনিয়ায় ভাঙা ও গড়া, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, জুলুম ও ইনসাফ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের যাবতীয় কাজ কারবার করার পর এমনিই মরে মাটিতে মিশে যাবে এবং তোমাদের কোন ভালো বা মন্দ কাজের কোন ফলাফল দেখা যাবে না? তোমরা কি নিজেদের এক একটি কাজের মাধ্যমে তোমাদের ও তোমাদের মতো হাজার হাজার মানুষের জীবনের ওপর এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসের ওপর বহুতর শুভ ও অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলে যাবে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পরই এই সমগ্র কর্মদপ্তরকে এমনি গুটিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে?

এ বিশ্ব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর দ্বিতীয় যে সত্যটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে, এখানে কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি নির্ধারিত জীবনকাল রয়েছে। সেখানে পৌঁছে যাবার পর তা শেষ হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যাপারেও একথাই সত্য। এখানে যতগুলো শক্তিই কাজ করছে তারা সবই সীমাবদ্ধ। একটি সময় পর্যন্ত তারা কাজ করছে। কোন এক সময় তারা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এ ব্যবস্থাটি খতম হয়ে যাবে। প্রাচীনকালে যেসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দুনিয়াকে আদি ও চিরন্তন বলে প্রচার করতো তাদের বক্তব্য তবুও তো সর্বব্যাপী অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন কিছুটা স্বীকৃতি লাভ করতো কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী নাস্তিক্যবাদী ও আল্লাহ বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা নিয়ে যে বিতর্ক চলে আসছিল, আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় চূড়ান্তভাবেই সে ক্ষেত্রে নিজের ভোটটি আল্লাহ বিশ্বাসীদের পক্ষে দিয়ে দিয়েছে। কাজেই বর্তমানে নাস্তিক্যবাদীদের পক্ষে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম নিয়ে এ দাবী উত্থাপন করার কোন অবকাশই নেই যে, এ দুনিয়া চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামত কোনদিন আসবে না। পুরাতন বস্তুবাদিতার যাবতীয় ভিত্তি এ চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বস্তুর বিনাশ নেই, কেবলমাত্র রূপান্তর ঘটতে পারে। তখনকার চিন্তা ছিল, প্রত্যেক পরিবর্তনের পর বস্তু বস্তুই থেকে যায় এবং তার পরিমাণে কোন কম বেশী হয় না। এরি ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত শুনানো হতো যে, এ বস্তুজগতের কোন আদি-অন্ত নেই। কিন্তু বর্তমানে আনবিক শক্তি (Atomic Energy) আবিষ্কারের ফলে এ সমগ্র চিন্তার ধারাই উল্টে গেছে। এখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং বস্তু আবার শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তার আকৃতিও থাকে না। ভৌতিক অবস্থানও থাকে না। এখন তাপের গতির দ্বিতীয় আইন (Second law of thermo-Dynamics) একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ বস্তুজগত না অনাদি হতে পারে, না অনন্ত। অবশ্যই এক সময় এর শুরু এবং এক সময় শেষ হতে হবে। তাই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানে কিয়ামত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বিজ্ঞান যদি আত্মসমর্পন করে তবে দর্শন কিসের ভিত্তিতে কিয়ামত অস্বীকার করবে?

www.icsbook.info

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ
مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

আর এরা কি কখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের পরিণাম এরা দেখতে পেতো।[৮] তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল, তারা জমি কর্ষণ করেছিল খুব ভালো করে[৯] এবং এত বেশী আবাদ করেছিল যতটা এরা করেনি।[১০] তাদের কাছে তাদের রসূল আসে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[১১] তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।[১২] শেষ পর্যন্ত যারা অসৎকাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল বড়ই অশুভ, কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা সেগুলোকে বিদ্রূপ করতো।

৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে, একথা বিশ্বাস করে না।

৮. আখেরাতের পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক যুক্তি। এর অর্থ হচ্ছে, কেবল দুনিয়ার দু'চারজন লোকই তো আখেরাত অস্বীকার করেনি বরং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। বরং অনেক জাতির সমস্ত লোকই আখেরাত অস্বীকার করেছে অথবা তা থেকে গাফিল হয়ে গেছে কিংবা মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এমন মিথ্যা বিশ্বাস উদ্ভাবন করে নিয়েছে যার ফলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে গেছে। তারপর ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, যেভাবেই আখেরাত অস্বীকার করা হোক না কেন, তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হয়েছে। তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীল আচরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ জিনিসটির বদৌলতে জাতিসমূহ একের পর এক ধ্বংস হতে থেকেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে মানব বংশ একের পর এক যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা কি একথা প্রমাণ করে না যে, আখেরাত একটি সত্য, যা অস্বীকার করা মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুকে সবসময় মাটির দিকে নেমে আসতে দেখেছে বলেই সে ভারী জিনিসের আকর্ষণ স্বীকার করে। যে বিষ খেয়েছে সে-ই মারা পড়েছে, এ জন্যই মানুষ

www.icsbook.info

বিষকে বিষ বলে মানে। অনুরূপভাবে আখেরাত অস্বীকার যখন চিরকাল মানুষের নৈতিক বিকৃতির কারণ প্রমাণিত হয়েছে তখন এ অভিজ্ঞতা কি এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আখেরাত একটি জাজ্বল্যমান সত্য এবং তাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা ভুল?

৯. মূল শব্দ হচ্ছে أَثَارُوا الْأَرْضَ কৃষিকাজ করার জন্য লাঙ্গল দেয়া অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে আবার মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভ থেকে পানি উঠানো, খাল খনন এবং খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বের করাও হয়।

১০. যারা নিছক বস্তুগত উন্নতিকে একটি জাতির সৎ হবার আলামত মনে করে এখানে তাদের যুক্তির জবাব রয়েছে। তারা বলে যারা পৃথিবীর উপায়-উপকরণকে এত বিপুল পরিমাণে ব্যবহার (Exploit) করেছে তারা দুনিয়ায় বিরাট উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং একটি মহিমান্বিত সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। কাজেই মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবেন এটা কেমন করে সম্ভব! কুরআন এর জবাব এভাবে দিয়েছে "এমন উন্নয়নমূলক কাজ" পূর্বেও বহু জাতি বিরাট আকারে করেছে। তারপর কি তোমরা দেখনি সে জাতিগুলো তাদের নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সহকারে ধূলায় মিশে গেছে এবং তাদের 'উন্নয়নের' আকাশচুম্বী প্রাসাদ ভুলুণ্ঠিত হয়েছে? যে আল্লাহর আইন ইহজগতে সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও সৎ চারিত্রিক গুণাবলী ছাড়া নিছক বস্তুগত নির্মাণের এরূপ মূল্য দিয়েছে সে একই আল্লাহর আইন কি কারণে পারলৌকিক জগতে তাকে জাহান্নামে স্থান দেবে না?

১১. অর্থাৎ এমন নিদর্শনাবলী নিয়ে যা তাদেরকে সত্য নবী হবার নিশ্চয়তা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখানকার পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে নবীদের আগমনের কথা উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, এর বাইরে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থায় এবং মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় আখেরাতের সাক্ষ বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে একের পর এক নবীগণ এসেছেন। তাঁদের সাথে তাঁদের নবুওয়াত সত্য হবার সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যেতো এবং যথার্থই আখেরাতের আগমন সম্পর্কে তাঁরা মানুষকে সতর্কও করতেন।

১২. অর্থাৎ এরপর এ জাতিগুলো যে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তা ছিল তাদের নিজেদের জুলুম। এসব জুলুম তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। যে ব্যক্তি বা দল নিজে সঠিক চিন্তা করে না এবং অন্যের বুঝিয়ে দেবার পরও সঠিক নীতি অবলম্বন করে না সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের জন্য দায়ী হয়। এ জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করা যেতে পারে না। আল্লাহ নিজের কিতাব ও নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের জ্ঞান দেবার ব্যবস্থাও করেছেন এবং তাকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্বিক উপকরণাদিও দিয়েছেন যেগুলো ব্যবহার করে সে সবসময় নবী ও আসমানী কিতাব প্রদত্ত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে পারে। এ পথনির্দেশনা এবং এ উপকরণাদি থেকে আল্লাহ যদি মানুষকে বঞ্চিত করে থাকতেন এবং সে অবস্থায় মানুষকে ভুল পথে যাবার ফল পেতে হতো তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহর বিরুদ্ধে জুলুমের দোষারোপ করার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারতো।

www.icsbook.info